সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘এখন হৃদয়’ : সময়ের ঘূর্ণিপাকে অনুভূতির শিকড় অনুসন্ধান

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

অধ্যক্ষ

খিদিরপুর কলেজ

সারসংক্ষেপ

বাংলা গল্পের জগতে সুচিত্রা ভট্টাচার্য এক অতি সুপরিচিত নাম। বিদগ্ধতার পাশাপাশি বিতর্কিতও বটে। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের দুনিয়ায় তাঁর অনায়াস গমনাগমন দৈনন্দিন জীবনে নরনারীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির জোয়ার-ভাঁটায়। কখনও বরফ চাপা শান্ত সময়ে একান্ত পথচারীর নিয়ন-নীরবতায় আবার কখনও জেট প্রজন্মের ভাবোচ্ছ্বাসিত অকারণ গরল-ফলশ্রুতির ফেনিল উদ্বেলতায়—জীবন ও অনুভূতিকে ঘটনাধারে বিচার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্রমাগত প্রয়াস করেছেন তিনি। নাটকীয় নির্মাণ, চমকপ্রদ দ্রুততা আর অভিনব রীতিতে আধুনিক জীবনবাস্তবতার চরম মুহূর্তগুলিকে তুলে ধরেছেন আশ্চর্য নৈপুণ্যে। তাঁর রচনাধারার মূল বিষয় হলো সাম্প্রতিক মানুষ—নর অথবা নারী, সমাজের থেকেও কখনও কখনও বড় যাদের নিজস্ব আইডেনটিটি। এই আইডেনটিটির স্পষ্টতা অথবা খর্বতা, ধারকতা অথবা নিস্পৃহতা, বহিরাবরণ অথবা মৌলিকতাকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় সাবলীল ভাবে যাচাই করতে চেয়েছেন তিনি। এরই ইঙ্গিত বহন করে চলেছে তাঁর ‘এখন হৃদয়’ গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি। এ গল্পগ্রন্থের গ্রন্থনামাঙ্কিত ‘এখন হৃদয়’ গল্পটিও তারই প্রমাণ। গল্পটির মূল চরিত্র ঠাকুমা বিজয়ার চোখে ধরা পড়েছে আর এক প্রজন্ম নাতনী রুমির বিবাহ বিচ্ছিন্ন অনুভূতিহীন জীবনের অসার বাস্তবতা। তবু ‘সব ফুলই ফোটে বসন্তে’-র মতো শাশ্বত অনুভূতির আবিস্কার এ গল্পের শেষে পাঠকের মনকে এক স্বস্তির সন্ধান দেয়। কৌশিক ও রুমির ভালোবাসার বিয়ে ও এক বছরের মধ্যেই আবেগের সমস্ত তাপ-উত্তাপ হারিয়ে বিচ্ছেদের প্রস্তুতি, রুমির পিতা-মাতার আশ্চর্য যুগ-সংক্রমণ ও কণ্যার সিদ্ধান্তের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের পাশাপাশি পূর্বপ্রজন্ম বিজয়ার মনের বিশ্লেষণী প্রতিক্রিয়া, আত্ম ভাবনায় শাশ্বত অনুভূতির শিকড়ের মূলানুসন্ধান আসলে আমাদের মৌলিক ও মানবিক অস্থিরতাকেই গল্পের আবহে স্পষ্টায়িত করে। সূর্যের ন্যায় জীবনের কোনো এক আদর্শ স্থিরবিন্দুতে নিবিষ্ট থেকে পৃথিবীর মতো বহুবর্ণী গ্রহদের পরিবর্তমান দ্রুতায়নের প্রত্যক্ষতার মতোই এ গল্পগ্রন্থের সমস্ত গল্প যথাঃ ‘মুহূর্ত’, ‘সহযাত্রী’, ‘ফিফটি ফিফটি’, ‘আয়নার মুখ’, ‘অন্য সুখ’ প্রভৃতি গল্পে লেখিকার অন্তর্দৃষ্টি ধাবিত হয়েছে। এ অন্তর্দৃষ্টিকে বর্ষিয়ান লেখিকার গভীর মননেরও এক সঙ্গত উত্তরাধিকার বলে মনে হয়। মহাকালের চূর্ণিপাকে বিলীন হতে চেয়েও প্রতিটি গল্পের শেষ ভাবনাটি এক প্রায় বিলীয়মান অথচ চেনা অনুভূতির পাদপ্রদীপে এসে তার অন্তিম নিষ্ক্রান্তিটুকুকে যথার্থ ভাবেই সফল ও সারগর্ভ করে তুলেছে।

মূল রচনা

সাহিত্য হলো যে কোনো সমাজের অগ্রবর্তীতার এক বড়ো পরিচয়। তবু সাহিত্যগুণই যেখানে প্রধানভাবে বিবেচ্য হওয়ার কথা সেখানে ভাল লেখার পরও শুধু নারী—পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তৈরী করা এই লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হয়ে মহিলা লেখিকাদের পুরুষ লেখকদের সঙ্গে চিরটাকালই যে প্রবলভাবে লড়তে হয়েছে বিশ্বে এমন নজির বড় কম নয়। বিশ্বসাহিত্যেও দেখা যায়, অনেক বিখ্যাত নারী সাহিত্যিকেরাই সুবিচার পাওয়ার আশায় নিরূপায় কৌশল হিসেবে নিজের নামকে আড়াল করে কখনো না কখনো কোনো এক পুরুষের ছদ্মনামে লিখেছেন। ঊনবিংশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাস 'মিডেলমার্চ'-এর লেখিকা ও সাংবাদিক মেরি আন ইভাস লিখেছিলেন 'জর্জ এলিয়ট' ছদ্মনামে। 'ইন্ডিয়ানা' গ্রন্থের রচয়িতা আমানতিনে-লুসিল-অররে দুদেভান লিখেছিলেন 'জর্জ স্যান্ড' ছদ্মনামে। 'ব্রাইড অ্যান্ড প্রিজুডিস', 'সেন্স অ্যান্ড সেনসিবিলিটি'র লেখিকা জেন অস্টেন লিখেছিলেন 'আ লেডি' ছদ্মনামে। কখনো 'ম্যারি পুপেল' ও বহু ধারাবাহিকের রচয়িতা পালেমা ল্যান্ডন ট্র্যাভারস-এর নাম হয়ে যায় পি.এল.ট্র্যাভারস। বারোটি খণ্ডে লেখা বিপুল জনপ্রিয় গ্রন্থ 'ইন ডেথ'-এর লেখিকা নোরা রবার্টসের কলমি নাম হয়ে যায় জে.ডি.রব; 'ফিফটি শেডস অফ গ্রে' উপন্যাস ত্রয়ীর লেখিকা এরিকা লিওনার্দ লেখেন ই.এল.জেমস নামে। এমনকি হালেও, হ্যারি পটার সিরিজের লেখিকার জে.কে.রাওলিংয়ের নামের নিচে ঢাকা পড়ে যায় তার জোয়ান রাউলিং নামটি। তার নামের মাঝের 'কে' অক্ষরটিও ছিল প্রকাশকের অনুরোধে বসিয়ে দেওয়া। 'রবার্ট গ্যালব্রেইথ' নামেও লিখেছেন তিনি। বিশ শতকে এসেও এই আঁধার কাটে নি। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের একজন পুরুষ সদ্য খ্যাতিমান হয়ে উঠলে তার খ্যাতির নিচে চাপা পড়ে যায় সেই পরিবারের নারী সদস্যের কীর্তি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারেই দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের কীর্তির পাশে ঢাকা পড়ে গেছে তাঁর বড় বোন স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) যাবতীয় কৃতিত্ব। অথচ তিনি বাংলা সাহিত্যের এমন এক প্রথম ও সার্থক লেখিকা যিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, কবি, সংগীতকার ও সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। আজও বাংলা সাহিত্যে আমরা যে ক'জন বিশ্বমানের পুরুষ সাহিত্যিকের দেখা পাই, সে অনুপাতে মহিলা সাহিত্যিকের দেখা পাই না। সমাজের অগ্রবর্তী বা ক্ষমতাশালী অংশের মানুষ হিসেবে পুরুষরা একটু এগিয়ে থাকবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু তাদের ঔজ্জ্বল্যের পাশে নারীরা একেবারেই ম্লান হয়ে যাবেন এটা শুধু অস্বাভাবিকই নয়, অমানবিকও বটে। পাশাপাশি নারী সাহিত্যিকের দ্রুত বিলোপ অথবা বিস্মরণই নয়, শুধুমাত্র 'নারী সাহিত্যিক' এই কারুণ্যময় পরিচয়ে তার সাহিত্যিক অবস্হানের কোনো নজিরই আজ আর কাম্য নয়।

বিপ্লবপূর্ব চীনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে একবার মাও জে দং বলেছিলেন, 'অন্যান্য দেশে বিপ্লবের জন্য যেখানে তিনটি স্তর যথাঃ সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে অতিক্রম করতে হয়, আমাদের সেখানে আরো একটি স্তর পার হতে হয়েছে। এই চতুর্থ স্তরটি হলো পুরুষতন্ত্র।' কথাটা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য। প্রাসঙ্গিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা সম্প্রতি প্রয়াত সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মূল্যায়ণ করি তবে তা যথার্থ অর্থেই এক সদর্থক মূল্যমানের বিষয় হয়ে উঠবে। এক সময় যাঁর শক্তিশালী লেখণী পড়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও ভুল করে পুরুষ সাহিত্যিক বলে ভেবে নিয়েছিলেন, বাংলা সাহিত্যে অন্যতম এক মহিলা সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর আগমন এক শক্ত জমির উপরেই। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আত্মপ্রত্যয়ী ও নিজের সবল বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। অনেকে তাঁকে মৈত্রেয়ী দেবী বা আশাপূর্ণা

দেবীর উত্তরসূরী বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, বারংবার যার প্রতিবাদও করে এসেছিলেন তিনি। যদিও মৈত্রেয়ী, আশাপূর্ণা ও মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন তাঁর জীবন ও সাহিত্যিক অনুপ্রেরণার মূল উৎস। তাঁদের ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন সংগ্রামের প্রতিফলন তাঁর গল্প-উপন্যাসেও লক্ষ্য করা যায়। লেখালেখি ছাড়াও, সমাজ সচেতনতার জায়গা থেকে রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনায় তাঁকে আমরা বহুবারই সরব হতে দেখেছি। একটি ঘটনায় নির্যাতিত হয়ে শর্মিলা বসু ও তার দুই কন্যা স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করলে সুচিত্রা ভট্টাচার্য বলেন, 'একজন মহিলাকে কোন পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছামৃত্যুর দাবি জানাতে হচ্ছে, ...স্বেচ্ছামৃত্যু কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এটা পলায়নবাদী মানসিকতা।' এই 'পলায়নবাদী মানসিকতা'কে তিনি কোনোদিনই সমর্থন করেন নি।

সত্তরের দশকের যে উত্তাল সময় ও সমাজ ব্যবস্হার মধ্যে থেকে সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর লেখালেখি শুরু করেন, সেই বাংলার মাটি তখনকার নারী সাহিত্যিকদের স্বাগত জানানোর জন্য কতটা প্রস্তুত ছিল এ প্রশ্ন আজো একেবারেই অবান্তর নয়। যদিও আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, নবনীতা দেব সেনের হাত ধরে তখন তা অনেকটাই শক্ত ভীতের উপর দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তবুও একদিন প্রতিষ্ঠা নয় বরং সাহিত্যিক হিসেবে পরিচয় পাওয়ার জন্যও তাঁকে সবলে লড়তে হয়েছে। তবু শেষপর্যন্ত সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর সাহিত্যিক অবস্থানকে এতটাই উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, অনেক সৌভাগ্যবান লেখকের মতো লেখালেখিতে পূর্ণ সময় দেওয়ার জন্য তিনি ২০০৪ সালে কাঙ্ক্ষিত সরকারি চাকরি থেকে তাঁর ইস্তফা পর্যন্ত জমা দিতে পেরেছিলেন। নব্বই-এর দশকে এসে সাহিত্যের বিচারে সুচিত্রা ভট্টাচার্য যখন তাঁর নিজ নামেই একাধিক যোগ্য সাহিত্যিক পুরস্কার ও ব্যক্তিগত খ্যাতির অনেকটাই লাভ করলেন তখনও তাঁর সৃষ্টির ফসলগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেলো, নারী হওয়া সত্ত্বেও পুরুষের বিচারে সুসাহিত্যকারই শুধু নয় বরং বরাবরই তিনি তাঁর অনায়াস দক্ষতায় পুরুষের সমকক্ষ সাহিত্যিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার স্পর্ধা অর্জন করেছিলেন।

কথাসাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে উপন্যাস লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কাঁচের দেওয়াল'। এই উপন্যাস দিয়েই তিনি পাঠক হৃদয়ে নাড়া দেন এবং ক্রমশঃ লেখালেখির জগতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। এছাড়াও তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল: কাছের মানুষ, দহন, হেমন্তের পাখি, নীল ঘূর্ণি, অলীক সুখ, গভীর অসুখ, উড়ো মেঘ, ছেঁড়া তার, আলোছায়া, অন্য বসন্ত, পরবাস, পালাবার পথ নেই, আমি রাইকিশোরী, রঙিন পৃথিবী, জলছবি, যখন যুদ্ধ, ভাঙ্গন কাল, আয়নামহল ইত্যাদি। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোটগল্পের মধ্যে মেঘপাহাড়, সুহেলি, ভালো মেয়ে খারাপ মেয়ে, দাগবসন্তি খেলা, আলোছায়া, তুতুল ইত্যাদি অন্যতম। তাছাড়া তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলি হলো: অচিন পাখি, আঁধারবেলা, একা জীবন, এখন হৃদয়, গহীন হৃদয়, চেনা মুখ অচেনা মুখ, জলছবি, দাবানলের দেশে, ধুসর বিষাদ, মন্থন, মাঝরাতের অতিথি, ময়না তদন্ত, শুধু প্রেম, শূন্য থেকে শূন্য, শেষ বেলায়, শেষ শান্তিপুর লোকাল, সময় অসময়, সর্পরহস্য সুন্দরবনে, সুখ দুঃখ, হলুদ গাঁদার বনে ইত্যাদি। তাঁর 'দহন' উপন্যাসটি বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। এ উপন্যাস একজন গৃহবধূ ও একজন সাবলম্বী স্কুল শিক্ষিকার জীবন সংগ্রামকে কেন্দ্র করে লেখা। নারী-স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থকে তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি এ উপন্যাসে, সমাজের নপুংসক আর ঠুনকো মুল্যবোধকে পাঠকের চোখের সামনে এনে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছেন। এ উপন্যাসের জন্য ১৯৯৬

সালে তিনি কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর শাশ্বতী সংস্থা থেকে পান থিরুমালাম্বা জাতীয় পুরস্কার। প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋতুপর্ণ ঘোষ ১৯৯৭ সালে এই উপন্যাস অবলম্বনে নির্মাণ করেন তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্রটি যা বেশ কয়েকটি ক্যাটাগরিতে জাতীয় পুরস্কার অর্জন করে। এছাড়াও 'ইচ্ছে', 'রামধনু', 'অলীক সুখ'-এর মতো বেশ কিছু জনপ্রিয় চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে তাঁর লেখা থেকে। প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে তিনি বহু ছোটগল্প এবং প্রায় চব্বিশটি উপন্যাস রচনা করেছেন।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে প্রায়শঃই বহুস্বরের উপস্থিতি দেখা যায়। মেজাজের দিক দিয়ে তা বৈঠকি ঢঙের। মূলতঃ শহুরে মধ্যবিত্ত জীবন এবং এর টানাপোড়েন নিয়ে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস লেখা হলেও মেয়েদের জীবনের ও তাদের নিজস্ব জগতের যন্ত্রণা, সমস্যার আর সম্পর্কের জটিলতার চিত্রও তিনি বারবার তুলে এনেছেন তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে। কোনো তত্ত্বীয় আবর্তে নিজেকে আবদ্ধ না করে ঘাত-প্রতিঘাত আর বাস্তবতার মাঝে দেখিয়েছেন নারীর দৈন্যতার অবস্থান আর সমাজ ব্যবস্থাকে প্রশ্নবানে বিদ্ধ করেছেন। সূক্ষ্ম প্রতীকি ব্যঞ্জনায় চরিত্র ও পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি ঘটনার নিবিড় বুননই তাঁর কথাসাহিত্যের অন্যতম শক্তি। 'অদ্ভুত আঁধার এক' আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজকে নিয়ে লেখা তাঁর নাতিদীর্ঘ উপন্যাস। এই ছোট্ট উপন্যাসটিতে তিনি নিঃসন্দেহে এক গোটা জীবন আঁকতে চেষ্টা করেছেন আর শেষপর্যন্ত বলতে চেয়েছেন, ব্যক্তি নয়, মূলতঃ এক অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থাই আসলে সমস্ত অসামাজিক কাজের জন্য দায়ী আর চরিত্ররা সেই পরিস্থিতির শিকার মাত্র।

বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে একুশ শতকের চলতি দশক পর্যন্ত সুচিত্রা ভট্টাচার্য মেধা, মনন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে জীবনের নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের বাস্তব চিত্র তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। সত্তরের 'নকশালবাড়ি আন্দোলন'-এর রেশ ও সামাজিক অবক্ষয়ের ক্ষত তখনও যথেষ্ট গভীর। এমন এক প্রেক্ষাপটে সমকালীন সামাজিক ঘটনাগুলোর ওপর ভিত্তি করে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প গড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে নারীর নিজস্ব মনোজগৎ, মনোজাগতিক সংকট আর সমাজ বাস্তবতা বার বার ফুটে উঠেছে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখায়। তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'কাছের মানুষ' সবিস্তারে লিখেছেন তিনি। তাঁর বৃহত্তম উপন্যাস 'কাছের মানুষ' অত্যন্ত জীবন ঘনিষ্ট। এই উপন্যাসই তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যায়। 'অন্য বসন্ত' উপন্যাসে তাঁকে অনেক বেশি সমাজ ঘনিষ্ট হতে দেখা যায়। আজকের এই যান্ত্রিক জীবনে মানুষের অনুভূতিগুলো কেমন? কেমন তাদের জীবনযাপন? চিরন্তন ভালোবাসা কি বেঁচে থাকে? এ ধরণের প্রশ্নের উত্তর খোজার চেষ্টা করেছেন লেখিকা তাঁর গল্পে-উপন্যাসে। সমকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের বিশেষতঃ সমকালীন সামাজিক ঘটনাগুলির ওপর ভিত্তি করে তাঁর কাহিনীগুলি রচিত হয়। শহুরে মধ্যবিত্তদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন, বর্তমান যুগের পরিবর্তনশীল নীতিবোধ, বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে নৈতিক অবক্ষয়, নারীদের দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁর রচনাগুলির মূল উপজীব্য।নর-নারীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন, বর্তমান যুগে নীতিবোধের ক্রমোবনতি, নৈতিক অবক্ষয়, নারীদের দুঃখ-যন্ত্রণার চালচিত্র বাংলা সাহিত্যে সুনিপুন ভাবে উঠে এসেছে কথাসাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখায়। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখণীর মূল বিষয় মানবিক সর্ম্পকের নানা জটিলতা এবং সূক্ষ্ম বোধের আত্মপ্রকাশ, যা সহজেই পাঠকের মনকে নাড়া দেয়। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখায় বার বার উঠে এসেছে শহুরে জীবনের সামাজিক সমস্যার কথা, মধ্যবিত্ত মানুষের সম্পর্ক আর মূল্যবোধের কথা, নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্তিত্বের কথা। তাঁর লেখনিতে রাজনীতি উঠে এসেছে

অন্যমাত্রায়, একটু অন্যভাবে; এর মাধ্যমে বোঝা যায় তিনি কতটুকু রাজনীতি সচেতন ছিলেন। সাহিত্যে নারী-ভাষ্য তৈরি করার একটা তাগিদ তাঁর মনে ছিল সব সময়ই। তিনি জানতেন সাহিত্যে উত্তর-ঔপনিবেশিকতা অনুযায়ী নির্যাতিতার ভাষাতেই তৈরি হবে তার মুক্তির সনদ। তাই বলতেই হয় যে, এক সময় নারীদের দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁর রচনার মূল উপজীব্য বিষয়ে পরিণত হয়। তবে সেইসঙ্গে একথাও ঠিক যে, তাঁর উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি যে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তা শুধুমাত্রই তাঁর ওপর সেঁটে দেওয়া অহেতুক নারীবাদীত্বের তথাকথিত ব্যঞ্জনাসর্বস্বতা নিয়ে নয়। তাঁর লেখা পড়লে যে কোনো নারীই আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠার প্রেরণা পায়, আর এখানেই সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখণীর সর্বাঙ্গীন সার্থকতা।

ছোটগল্পের জগতেও সুচিত্রা ভট্টাচার্য নর-নারী মনের অতলে গভীর ভাবনার অনুসন্ধানী। আধুনিক ঘাত-প্রতিঘাতময় মানবিক সম্পর্কায়নের গল্প বলার ক্ষেত্রে তিনি উচ্চকিত, তাই গল্পের বিষয় নির্বাচনেও ভীষণ রকমের আধুনিক ও প্রগতিপন্থী। মেয়েদের হয়ে মেয়েদের কথা বলতেও তিনি ভালোবাসেন যাকে নিছক নারীবাদিতার তকমা দিয়ে আটকে রাখা যায় না। তাঁর নিজের ভাষায়ঃ "আমার গল্পে মোটামুটি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, মূল্যবোধ, মূল্যবোধের ভাঙন, মূল্যবোধের পরিবর্তন ইত্যাদি স্হান পেয়ে থাকে। এছাড়া মেয়েদের হয়ে মেয়েদের কথা বলতে আমি বেশি ভালোবাসি। আমার লেখায় সাধারনতঃ মেয়েদের সমস্যা, মেয়েদের মৌলিক যন্ত্রণার কথাই বারবার ফিরে আসে।"[১] বস্তুত তাঁর রচনায় মেয়েদের কথা কখনো কখনো এতটাই প্রাধান্য পায় যে সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার মতোই 'মিতিন মাসি'রূপ মধ্যবিত্ত ও মধ্যবয়স্কা গোটা একটা নারী গোয়েন্দা চরিত্রই রচিত হয়ে যায়—স্বামী সন্তান সহ ঘর সামলালেও যিনি জটিল সব রহস্যের কিনারাও করেন। চরিত্রটির সাথে লেখিকার নিজের সত্ত্বারও এক আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে বলা যায়, দৈনন্দিন নাগরিক জীবনে নর-নারীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে নাড়াচাড়া করে সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য তার মন ও মননের গভীরে পৌঁছতে চান। নর-নারী মনের যে ভাবনাগুলি কখনও প্রকাশিত হয়, আবার কখনও বরফ-শান্ত সময় আর তার একান্ত নীরবতার মধ্যে থেকেও সমস্ত হৃদয় জুড়ে ছটফট করে লেখিকা যেন সেই সব অনুভূতির শেকড় ধরেই টান দিতে চান। 'হেমন্তের পাখি'র অদিতির স্বপ্নিল উত্তরণ কিংবা 'নারীতান্ত্রিক'এ বিমানের গৃহকর্ম করা আর স্ত্রী অনুরাধার অফিসে চাকরি করা তারই সাক্ষী বহন করে। তাঁর 'অন্য অনুভব', 'খাঁচা', 'ময়না তদন্ত', 'এখন হৃদয়' গল্প সংকলনগুলির বেশ কিছু গল্পও প্রায় একই ভাবনার ইঙ্গিত বহনকারী।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পগ্রন্থ 'এখন হৃদয়' অগভীর ভাসমান হৃদয়ের নানা বর্ণচ্ছটা ও মাত্রা নিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গল্প পরিমন্ডলে জেগে আছে। পনেরোটি গল্পে সমন্বিত এই গল্প সংকলনটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতা বইমেলায় ২০০৪ সালে। সংকলনটির নির্বাচিত কিছু গল্পের মধ্যে দিয়ে সুচিত্রা ভট্টাচার্য অন্তঃসারশূন্য, অগভীর হৃদয়বিশিষ্ট এক বিচিত্র ও অদ্ভুত সমাজ-দর্শনের প্রতি আলোকপাত করেছেন। আধুনিক গতিশীল জীবনে মানুষ কর্ম, পেশা আর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক বেশী চিন্তিত। তাই নাগরিকতার এই ক্রমধাবমান প্রয়োজনসর্বস্ব স্বার্থপরতার জীবন থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় তার আবেগ, অনুভূতি, সহানুভূতি, মূল্যবোধের মতো মূল্যবান অনুভূতিগুলি। ক্রমশঃ মানুষ হয়ে পড়ে যান্ত্রিক, আত্মকেন্দ্রিক। পারস্পরিক স্নেহ, ভালোবাসার সম্পর্কগুলি ক্রমশঃ হয়ে যায় ঠুনকো। এই সম্পর্কগুলি যেন বালির বাঁধের মতই ক্ষণস্থায়ী, গড়ার পরেই দ্রুত ভাঙ্গার দিকেই যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশী প্রবল। দ্রুত প্রবাহমান জীবনপথে

সম্পর্ক যেমন চটজলদি গড়ে ওঠে, তেমনি তা ভাঙতেও খুব বেশি সময় লাগেনা। সম্পর্কের বন্ধনগুলো অসংগঠিত ও অগভীর হৃদয়ের মধ্যেই দ্রুততার সাথে ওঠানামা করে, কখনই তা প্রকৃত ভালোবাসার অতল গহ্বরে প্রবেশ করে না। 'এখন হৃদয়' গল্পগ্রন্থের 'এখন হৃদয়' গল্পে বিবাহ বিচ্ছেদকামী রুমির বাবা দীপুর কণ্ঠে যুগোপযোগী সেই কথাটিই তাই যেন শোনা যায়- "এটা গতির যুগ মা। সব কিছুতেই স্পিড। গড়তেও স্পিড, ভাঙ্গতেও স্পিড। আজ বলবে আই লাভ ইউ, কাল বলবে আই হেট ইউ।"[২] গল্পে দেখি, বর্তমান প্রজন্মের প্রতিনিধি চরিত্র রুমি-কৌশিক নিজেদের পছন্দ মত লাভ ম্যারেজ করলেও, খুব শিঘ্রই তাদের দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে 'ডিভোর্স' পর্ব। তুচ্ছ সন্দেহবাতিকতা, সামান্য বনিবনা না হওয়া, মনের নগণ্য অমিল প্রভৃতি অহেতুক কিছু কারণকে হাতিয়ার করে তারা 'বিবাহ' নামক এক শক্তিশালী সামাজিক বন্ধনকে এ গল্পে ক্রমেই শিথিল করে তুলেছে। অথচ এমন সমস্যাগুলিকে রুমির ঠাকুমা বিজয়ার সমকালে সংসারজীবনের এক নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় অথবা অতি সামান্য ব্যাপার হিসেবেই দেখা হত। এসব তুচ্ছ কারণের জন্যও যে একটা সম্পর্ক ভেঙ্গে যেতে পারে এমনটা তাই বিজয়ার কখনো মনে হয় না। আসলে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যে গভীরতা থাকা দরকার বর্তমান অসহিষ্ণু দাম্পত্য সম্পর্কে তা অস্বাভাবিক ভাবেই কমতে বসেছে, ভয়ংকর ভাবে তা তলানিতে গিয়ে পৌঁচেছে। তাই তো কত সহজ ভাবে নতুন প্রজন্মের রুমি বলতে পারে, "একটা সম্পর্ক তৈরি হওয়া উচিত ছিল, হতে হতেও হল না, ব্যস ফিনিশ। এর জন্য বিছানায় শুয়ে সাতদিন গড়াগড়ি দেব কোন্ দুঃখে?"[৩] রুমির বলা আপাত সরল এই উক্তিটিতেই বর্তমান সম্পর্কের দৈন্যতাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'এখন হৃদয়' গল্পের রুমি-কৌশিক চরিত্রে সম্পর্ক ভাঙার জন্য কোনো আফশোস নেই, নেই শোক-তাপ, মর্মপীড়া কিম্বা হা-হুতাশা। আছে শুধু পুনরায় স্বাভাবিক জীবনের ছন্দময় স্রোতে ফিরে আসার এক অস্বাভাবিক তাড়া। কিন্তু সম্পর্কের এই চরম অবমাননার ক্ষণেও একদিন গভীর রাতে আচমকাই নাতনি রুমির চোখে মুক্তোদানার মতো টলটল করা চোখের জল দেখতে পান বিজয়া। এই আবেগকেই তো তিনি এতদিন রুমির চোখে দেখতে চেয়েছিলেন! গল্পের শেষে বিজয়ার অনুভূতি লেখিকার ভাষায়ঃ "বুকটা চিনচিন করছিল বিজয়ার। আবার যেন কেটেও যাচ্ছিল ভেতরের ভ্যাবসা ভাবটা। হে ঈশ্বর, চোখ করকর করার জন্য ওই বালিটুকু যেন পৃথিবীতে থাকে চিরকাল।"[৪] কালের সর্বনাশা প্রভাবে সর্বনাশ যা ঘটার তা তো ঘটবেই। গল্প পাঠের শেষে পাঠকের মনে হয় রুমি-কৌশিকের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, তাকে কেউ—এমন কি বিজয়াও আটকাতে পারবেন না। কিন্তু গল্প-শেষে মুক্তোর দানার মতো যা রুমির চোখে ঐ টলটলে একবিন্দু চোখের জল এনেছে—তাই-ই তো আসলে অন্তরের বিশুদ্ধ ভালোবাসার বালুকণা, যা রুমি-কৌশিকের সমস্ত দাম্পত্য বনেদের উৎস। আমরা জানি, ঐ একরত্তি মুক্তোবিন্দু রূপ টলটলে দু-চোখের জলই প্রেমাবেগের বন্যা হয়ে বিচ্ছেদের সকল ভ্রকুটিল সম্ভাবনাকে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বিজয়া যতই বলুন, তা নিছক 'চোখের বালি' নয়। সমগ্র গল্পের মধ্যে শেষের ঐ লাইন কটিই পাঠকের হৃদয় কন্দরে এক স্বস্তির বার্তা বয়ে আনে। যান্ত্রিক জীবনে মানবিকতা যে এখনও মরে নি গল্পের শেষটি তারই ইঙ্গিত রেখে যায়।

একই ভাবে 'এখন হৃদয়' গল্পগ্রন্থের অন্যকিছু গল্পেও নর-নারীর দাম্পত্য জীবন কেন্দ্রিক সমস্যা, পারিবারিক প্রজন্ম এবং ব্যক্তিগত জীবনের আবহে গড়ে ওঠা সমস্যার প্রকট বহিঃপ্রকাশগুলিকে খুঁজে পাই। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ সমস্যাগুলিও দাম্পত্যকেন্দ্রিক আধুনিক নগরজীবনেরই সমস্যা। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখা 'ফিফটি ফিফটি' গল্পে অয়ন ও সমঋতার অস্থায়ী বাড়িতে পাতানো সংসারজীবন কয়েক মাসের ব্যবধানেই ভেঙ্গে গেছে। শেষ পর্যন্ত তারা এক সঙ্গে নয়, বছরে দু-একবার করে অনির্দিষ্ট স্থানে

মিলিত হওয়ার জীবনকেই বেছে নেয়। এভাবে দুজনে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়, যেখানে পরবর্তী প্রজন্মের আগমনের জন্য নির্দিষ্ট বা উপযুক্ত কোনো পরিমণ্ডল রচিত হয়না। তাঁর লেখা 'মুহূর্ত' গল্পটিতে দেখি মনীষা-সুকান্ত প্রেম করে বিয়ে করলেও তাদের সংসার জীবনে ফাটল ধরেছে। শেষমেশ তাদের প্রেম এক তীব্র ঘৃণায় রুপান্তরিত হয়েছে। অবশেষে ছেলের কাছে সুকান্ত তার পিতৃত্বের অধিকার হারিয়েছে। কারণ এখন "পিতৃত্বও রিলেটিভ ব্যাপার....।"[৫] তাই ছেলে বাবা বলে মানলেই সে বাবা, "না ভাবলেই টোটাল আউট সাইডার।"[৬] রক্তের সম্পর্কও সেখানে অতি সামান্য বিষয়। সুকান্ত স্ত্রী-পুত্রহীন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে। অপর দিকে জয়া স্বামী-পুত্র-শ্বশুর থাকা পরিপূর্ণ সংসারেও একাকিত্ব অনুভব করেছে। বিশেষ করে স্বামী অতীনের কর্মব্যস্ত জীবনের তাড়া আর উদাসীনতা জয়াকে ভেতরে ভেতরে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ক্রমশঃ সেও ডানা মেলার অবকাশ খোঁজে। যাত্রাপথে সুকান্ত-জয়া উভয় উভয়কে উপযুক্ত জীবনসঙ্গী রূপে পেয়ে নিজেদেরকে মুহূর্তের জন্য হলেও সমর্পণ করে। তাদের মনে হয়ঃ "দুটো একা মানুষ একটা মুহূর্ত কুড়িয়ে পেয়েছে হঠাৎ। হয়তো বা একটু পরে হারিয়েও যাবে মুহূর্তটা। তবু ক্ষণিকের তরে যদি তাকে ছুঁয়ে থাকি ক্ষতি কী ?"[৭] প্রজন্মের ব্যবধানের যুগচিহ্নও বহন করে চলেছে গল্পটি। দাম্পত্য জীবন সমস্যার আর একটি ভিন্ন চিত্র 'বীরপুরুষ' গল্পে ফুটে ওঠেছে। মমতা-সুব্রত সংসার জীবনে পরস্পরকে সন্দেহ করে গেছে, মীমাংসার পথ খোঁজেনি। সুব্রতর মেরুদণ্ডহীন পৌরুষত্ব ও মমতার রাগী অসহযোগী মনোভাবকে সমস্যার মূল কারণ হিসেবে ধরে নিলেও সুব্রতর দুর্বল মানসিকতা তাদের পুনরায় এক সংসারে ফিরিয়ে এনেছে। 'সহযাত্রী' গল্পে রাজধানী এক্সপ্রেসে রম্যাণি ঋষির সঙ্গে পরিচয় ও মুহূর্তে তৈরি হওয়া সম্পর্ককে অস্বীকার করতে পারেনি। ঋষিকে তার মনে হয়েছে "এক আত্মীয়পরিচয়হীন নিরাশয় নিঃসঙ্গ মানুষ শুয়ে আছে অসহায়।"[৮] এক দুর্বল মুহূর্তে মোহগ্রস্তের মত ঋষির ঝুলে থাকা কম্বলটা দিয়ে সে পরিপাটি করে ঋষির দেহ ঢেকে দেয়। এ গল্পটিও মানুষী সম্পর্কের আবেগ ও উত্তাপ নিয়ে আমাদের ভাবায়। এছাড়া নাগরিক জীবনে নর-নারীর জীবন সমস্যার ছবি দেখতে পাই তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থের কিছু গল্পেও। এর মধ্যে 'লালগোলাপ' (বিশ্বজিৎ ও তৃণা), 'পঁচিশ বছর' (রাকেশ ও সরসী), 'মনের মধ্যে মন' (সুজয় ও দীপা), 'অসময়' (শৈবাল ও গল্পের নায়িকা) অন্যতম। 'নারীতান্ত্রিক', 'বাদামী জড়ুল' কিংবা 'উল্টোপুরাণ' গল্পেও নারী জীবনের নানা সমস্যার দিকগুলিকে তুলে ধরেন গল্পকার। 'এপার ওপার' গল্পে আছে 'লিভ টুগেদার' নামক জটিল জীবন যাপনের কাহিনী।

আধুনিক নাগরিক সমাজ ও তার মনের সংকীর্ণতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখা 'এখন হৃদয়' গল্পগ্রন্থের বেশ কিছু গল্পে। সমাজের এক স্তরের মানুষের মনের সংকীর্ণ মানসিকতার ভয়াল ও ভয়ংকর রূপগুলি দেখতে পাই তাঁর লেখা 'খুরশিদ', 'আয়নার মুখ', 'নক্ষত্রের মন' প্রভৃতি গল্পগুলিতে। 'আয়নার মুখ' গল্পে অশোক-রুমার একমাত্র সন্তান জোজোকে ধনরাজ পুরীতে সমুদ্রের গ্রাস থেকে প্রাণে বাঁচায়। বিনিময়ে অনিচ্ছুক ধনরাজকে দম্পতি জোর করে একশো টাকা ধরিয়ে দেয়। সেই ধনরাজই একসময় ওড়িশার প্রবল ঝড়ে প্রায় সর্বহারা হয়ে কলকাতায় আসে। সে অশোক-রুমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা জানালেও ধনরাজের মহৎ কৃতিত্বের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা একবারের জন্যও অশোক-রুমার বিবেক বোধে তৈরী হয়নি; বরং বারবার টাকার অঙ্কে মেপে তাকে তারা ছোট করেছে। অবশ্য মনুষ্যত্ব ও বিবেকবোধে ভরপুর ধনরাজ তাদের সংকীর্ণ মানসিকতার ধার দিয়েও যায় নি। নিঃস্বস্বলপ্রায় ধনরাজ দেখা করলেও কোনো আর্থিক সাহায্য চায়নি, বরং ওড়িশার প্রাণঘাতী ঝড়ের বুকে পাওয়া ভালোবাসার প্রতীক স্বরূপ 'বিনায়ক-মুখ শঙ্খ' জোজোকে দান করে সে অশোক-রুমাকে সেই আয়নার সামনেই দাঁড় করিয়ে

দেয়, যেখানে ভদ্রতার পোশাকী ছদ্মবেশের আড়ালে তাদের নিজেদের আত্মকেন্দ্রিক নীচ মানসিকতার রূপটিই ধরা পড়ে। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেকদিন আগে বলেছিলেন যে মানুষ খাঁটি কি না, তা চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে। এই জায়গায় নাকি ফাঁকি চলে না, আর তাই এইখানেই মানুষের যথার্থ রূপ প্রকাশ পেয়ে যায়। এই উপলব্ধি যে এক চিরন্তন সত্য তা আজও বেশ বোঝা যায় 'আয়নার মুখ' গল্পটি পড়লে। আত্মকেন্দ্রিক অশোক-রুমার শেষ অনুভূতি এ গল্পে আত্মগ্লানিতে বিদ্ধ, তা লেখিকার ভাষায়ঃ "ধনরাজ চলে গেছে অনেকক্ষণ। ন যযৌ ন তস্থৌ বসে আছে স্বামী-স্ত্রী। কেউ কারুর মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। নিজেদের ক্ষুদ্রতা আর দীনতার ভারে পীড়িত হচ্ছে।"[৯] আত্মকেন্দ্রিকতার আর এক চরম সাক্ষরবাহী গল্প হল 'নক্ষত্রের মন'। গল্পটির বিষয়বস্তুতে দেখতে পাই নীলাদ্রি ও মৃন্ময় স্কুল লাইফে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। লেখকের ভাষায়ঃ "স্কুলে তো তারা সত্যিই অভিন্ন হৃদয় ছিল।"[১০] স্কুল জীবনের নানা পর্বেই মৃন্ময় হয়ে উঠেছিল নীলাদ্রির প্রকৃত সাথী। নীলাদ্রিকে টিফিন খাওয়ানো, নীলাদ্রির জন্য এক্সকারশনে না যাওয়া, পরীক্ষায় ইনভিজিলেটরের চোখ বাঁচিয়ে নিজের খাতা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করার মত ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রেখেছে মৃন্ময় দীর্ঘ এগারো বছর ধরে তার বন্ধু নীলাদ্রির প্রতি। আর ফলশ্রুতিস্বরূপ স্কুলের স্যারের কাছ থেকে পাওয়া 'আইসোটোপ' খেতাবটিও অর্জন করেছে সে। এমনকি মৃন্ময়ের চাপেই নীলাদ্রির সঙ্গীত সাধনার শুরু পাকাপাকিভাবে। আজ নীলাদ্রি বিখ্যাত গায়ক, প্রচুর টাকার মালিক। এমন সময়ে সেই মৃন্ময়ের ফোন পেয়ে খানিকটা হতচকিত হলেও তাতে একেবারে বিস্মিত হয়নি নীলাদ্রি। কারণ, আজ তার নাম, যশ, অর্থ সবই আছে। তাই সে মনে করে স্বার্থের জন্য তার সঙ্গে মৃন্ময়ের সাক্ষাৎ করাটা আজ কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। গল্পের নীলাদ্রি আজ শুধু সেইটুকুই ভাবে, বাল্যকালের বন্ধুত্বের সেই পুরনো হৃদ্যতার কথা সে কখনো ভাবে না। অবশেষে বিপদে পড়া মৃন্ময় ছেলের অপারেশনের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার চাইলে বর্তমানের নীলাদ্রি জেগে ওঠে। মৃন্ময়কে নার্সিংহোমে অপারেশন না করিয়ে হাসপাতালে অপারেশন করানোর পরামর্শ দেয় সে, টাকা না দিতে পারার জন্য নিজের গাড়ি কেনার মতো মিথ্যে অজুহাত শোনায়। মৃন্ময়ের করুণ আবেদন শুনে শেষ পর্যন্ত এমন একটা অ্যামাউন্ট (দশ হাজার টাকা) নির্ধারণ করে, যেটা ফিরে না পেলেও দেহে-মনে তার কোনও আঁচড় লাগবে না। শেষ পর্যন্ত মৃন্ময় সেই টাকাটা নেয়নি, সে চলে গেছে। গল্পটি পড়তে পড়তে সত্যজিৎ রায়ের 'ক্লাসফ্রেন্ড' গল্পটি মনে পড়ে যেতে পারে। 'ক্লাসফ্রেন্ড' গল্পে ধনী মোহিত সরকার বাল্যবন্ধু জয়দেবকে তিরিশ বছর পর প্রথমে চিনতে না পেরে রূঢ় ব্যবহার করে। পরে জয়দেবের পরিচয় জানতে পেরে যথার্থ বন্ধুর ভূমিকাই পালন করেছিল সে। কিন্তু এ গল্পের নীলাদ্রি তা করেনি, কারণ মনের দিক থেকে সে মোহিতের মতো অতখানি উদার নয়। মৃন্ময়ের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর প্রয়োজনীয়তাটুকুও অনুভব না করে, বন্ধুত্বের এক কৃত্রিম ক্ষোভ তৈরি করে মৃন্ময়ের উদ্দেশ্যে নীলাদ্রি বিড়বিড় করে বলেঃ "তোর এত দেমাক কীসের রে মৃন্ময়, অ্যাঁ ? এসেছিলি তো ভিক্ষে চাইতে। আমি কেন যাব, দরকার হলে তুই-ই আবার আসবি। বুঝলি শালা?"[১১] আধুনিক নগরজীবনে মানুষের মানসিকতা, বিবেকবোধ সহ সম্পর্কের নানা কোণগুলিতে যে ঘুণপোকার বাস যা একপ্রকার সামাজিক ব্যধিরই সামিল, তাকেই এ গল্পে এক অনাবিল ভঙ্গিমায় তুলে ধরছেন সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য। কার্গিল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর 'খুরশিদ' গল্পটি। এ গল্পে জীবিকার তাড়নায় খুরশিদ শাল বিক্রি করার জন্য কলকাতায় এসে গল্প কথক ও তার স্বামী দীপকের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত হয়। খুরশিদ তাদের আপন করে নিলেও সভ্য শিক্ষিত সমাজের ধ্বজাধারী দীপকরা তা করতে পারেনা। কংক্রিটপূর্ণ চার দেওয়ালে আবদ্ধ হৃদয়গুলি থেকে অসীম আকাশ তুল্য সত্যিকারের হৃদয়ের সন্ধান পায়না খুরশিদ। ভদ্রতার মুখোশধারী মানুষগুলির চোখের সামনে বিবেকের আলো জ্বেলে দিতে খুরশিদ বলেঃ "দেশ কি সির্ফ মিট্টিসে বনতা হ্যায় বাবুজি? দেশ তো আদমি সে হি বনতা হ্যায়। ফিলিংসসে বনতা হ্যায়। আপনারা যদি আমার আপনা হন, তো দেশ কেন

আপনা হবে না?”[১২] তবু সহজ সরল খুরশিদকে তারা টাকার অঙ্কে মেপেছে, উগ্রপন্থী ভেবে দূরে সরিয়ে রেখেছে। খুরশিদের অসহায়তাকে কখনও আন্তরিকতা দিয়ে বোঝেনি। তাদের সাফ কথায়ঃ “খুরশিদ কেমন, তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা করে আমাদের লাভ নেই। তবে ওর সঙ্গে বেশি মাখামাখি করাটা বোধ হয় আর ঠিক নয়।”[১৩] দীপকের এই স্পষ্ট উক্তি সভ্য-ভদ্র সমাজের মেকী রূপকেই চিহ্নিত করে। কাশ্মীরের মত স্পর্শকাতর জায়গায় যার বসবাস, তার জীবন, জীবিকা সবেতেই আছে অনিশ্চয়তা। এ হেন খুরশিদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির পরিবর্তে এসেছে মর্মভেদী আঘাত, যন্ত্রণা আর পুলিশি অত্যাচার। কাশ্মীরের নয়নের মণি চিনার কিংবা গোলাপগাছ বিদেশী হলেও কাশ্মীরের মাটি ও মানুষ তাকে আপন করে নিয়েছে, কিন্তু কলকাতার নাগরিক সমাজ বারবার খুরশিদকে শুধু সন্দেহ ও স্বার্থের মাপকাঠিতেই বিচার করেছে, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকার সুস্হ পরিবেশটুকু পর্যন্ত দিতে পারে নি।

আত্মকেন্দ্রিকতা আধুনিক নগর জীবনের এক অতি উৎকট সমস্যা। তারও বহিঃপ্রকাশ আছে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কিছু গল্পে। আধুনিক আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার এক বড়ো সাক্ষী তাঁর ‘এখন হৃদয়’ গল্পগ্রন্থের ‘রাঙাকাকা’ গল্পটি। নিজের সুখ ভোগের জন্য পরিবারের সঙ্গে দ্রুত নাড়ির বন্ধন ছিন্ন করেন রাঙাকাকা। চৌদ্দ সদস্যের একান্নবর্তী পরিবারে বেড়ে ওঠা হাসিখুশি প্রকৃতির রাঙাকাকা অবচেতন মনে এই মায়ার জাল কেটে বেরিয়ে আসার বাসনা সুপ্ত অবস্থায় লালন করলেও তা কাউকে বুঝতে দেননি। একসময় কোম্পানির সূত্রে জার্মানি যাওয়ার অফার পেলে তিনি তার সৎ ব্যবহার করেন। মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অভাব তাকে ক্ষণিকের জন্য বিচলিত করলেও অচিরেই তিনি তার অতৃপ্ত স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার পথে অগ্রসর হন। জার্মানি যে ব্যক্তিগত সুখভোগের ক্ষেত্রে কলকাতার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট সে কথা ভেবে আড়াই বছরের মধ্যে ঠিক মতো পরিবারের খোঁজ খবর না নেওয়া, স্বদেশী চাকরি পরিত্যাগ করা এবং জার্মানির নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য এক জার্মানি মহিলাকে বিয়ে করার মধ্যে দিয়ে জন্মভূমির সঙ্গে রাঙাকাকা তার সম্পর্ক ছেদের পাকাপাকি ব্যবস্থা করেন। আড়াই বছর পরও জন্মভূমির জন্য নাড়ির টান তার হৃদয়ে জাগ্রত হয়নি; পরিবর্তে তার মনে জন্মভূমি সম্পর্কে যাবতীয় ক্ষোভ ও ঘৃণা উগরে বেরিয়ে এসেছে। লেখকের ভাষায়ঃ “কত বদলে গেছে রাঙাকাকা। যে কদিন রইল, সারাক্ষণ শুধু কলকাতার নিন্দে। ওহ, হোয়াট এ ন্যাস্টি সিটি! হেল হেল, রিয়েল হেল। এত নোংরা, এত পলিউটেড্ শহরে কী করে যে বাস করে মানুষ! জার্মানি হলে সমস্ত বাস লরি রাস্তায় ব্যানড্ করে দিত। রাস্তা ঘাটের কী দশা! ভাঙ্গাচোরা! গর্ত! অসভ্যর মত জ্যাম! সিটিজেনদের এতটুকু সিভিক সেন্স নেই! ভিকিরি আর হকার দখল করে নিয়েছে ফুটপাত! ফ্র্যাংফূর্ট হলে সবকটাকে ধরে ধরে গারদে পুরত!”[১৪] আত্মসুখে মগ্ন রাঙাকাকা দীর্ঘ দিন পর নিজের পূর্ব ঠিকানাই ভুলে গিয়ে জানান যে বাড়িটাই ভুলে গেছেন। শেষ পর্যন্ত রাঙাকাকা জার্মানিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তার অন্তিম পরিনতি অবশ্যই পাঠক বর্গের সহানুভূতি আদায় করে, কিন্তু নিজের মাতৃভূমির প্রতি তার এই বিরুদ্ধ মনোভাবকে পাঠক কখনই সমর্থন করে না। গল্পের শেষে গল্পকারের মৌলিক প্রশ্নটি যা, আদতে পাঠকেরও তাই। সেটি হলোঃ “কত দূর পর্যন্ত প্রোথিত থাকে মানুষের শিকড়? কত বছর সময় লাগে তাকে উপড়ে ফেলতে? জানি না। উত্তরটা খুঁজছি।”[১৫] বারংবার পাঠেও অনুভূতির এই শিকড় অনুসন্ধান গল্পটিকে আজও প্রাসঙ্গিক করে তোলে। ‘এখন হৃদয়’ গল্পগ্রন্থের ‘সুধাকর’ গল্পের সুধাকরকেও আমরা প্রায় রাঙাকাকার ভূমিকাতেই দেখতে পাই। হালকা চালের লেখক সুধাকর। তার লেখার প্রকৃতি সম্পর্কে তার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরও মত হলঃ “পাতার পর পাতা শুধু পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য মার্কা ক্যাতকেতে জোলো কাহিনী। ভাষা কাঁচা, প্লট দুর্বল, লেখার ভঙ্গিও মান্ধাতা আমলের। চল্লিশ বছর ধরে কলম পিষেও এখনও স্কুল ম্যাগাজিনের লেখক রয়ে গেল। নিসর্গ প্রেম, মানবিক

সম্পর্কের জটিলতা, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, সমকালীন সমাজ, কিছুই ফোটেনা লেখায়।"[১৬] এ গল্পে দেখি, লেখক তার নিজের সম্পর্কে নিজের অবস্থান বুঝেও না বোঝার ভান করে গেছে। সংসার, চাকরি, ভবিষ্যৎ কিছু নিয়েই ভাবেনি, শুধু নিজের ভালোলাগার আত্মকেন্দ্রিক জগতেই চিরটাকাল ডুবে থেকেছে। স্ত্রী শ্রীময়ীকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর কোলে। শ্রীময়ীর একনিষ্ঠ পতি সেবাকে সুধাকর শুধুমাত্র নিজের সুখ ভোগের ক্ষেত্রেই কাজে লাগিয়েছে, যথার্থ জীবন সঙ্গীর ভূমিকা সে পালন করেনি। অসুস্থ শ্রীময়ীর জন্য প্রথম দিকে সে দায়সারা ভাবে কবিরাজি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। যখন ক্রমে রোগ বৃদ্ধি পায়, তখন কবিরাজের পরামর্শে আর-জি-কর হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে এবং ক্যানসার ধরা পড়ার পরেও কোনও ক্যানসার বিশেষজ্ঞকে না দেখিয়ে, কেমোথেরাপি না করিয়ে, শুধুমাত্র হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়ে কর্তব্যের নামে সে নিজের অসার দায়িত্ব সেরেছে মাত্র। স্ত্রীর প্রতি সুধাকরের এই উদাসীনতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণেই শ্রীময়ীর মৃত্যু হয়। অথচ ভালো চিকিৎসার জন্য তিনি কোনো আগ্রহ দেখাননি, মুখে 'ফানুশমার্কা' এই বুলি নিয়েই নিজেকে সে বড়ো লেখকের দাবিদার করে তুলেছে। 'অন্য সুখ' গল্পের সমীর দত্তও এক আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। সে যৌবনে ভোগবিলাসে জীবন কাটালেও বর্তমানে তার সেই অবস্থায় ভাঁটা পড়ে। বন্ধু পার্থসারথি সেনের কঠিন সময়গুলোতে সে পাশে দাঁড়ায়নি, অর্থ দিয়ে সাহায্যও করেনি, বরং তাকে গুরুত্বহীন মনে করে স্পষ্ট ভাবে অপমান ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। অপরদিকে পার্থসারথি সেনের অবস্থা যখন ঊর্ধ্বমুখী, যখন সে একজন বিখ্যাত গায়ক, তখন সেও দুর্বল সমীরকে তার বন্ধুত্বমূলক মহত্বের পরিচয় দিতে পারে নি। বরং তাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চেয়ে পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে সে। সংকীর্ণতা, হৃদয়হীনতা, স্বার্থান্বেষী ভাবনা ও সন্দেহপ্রবনতা এই শব্দগুলিই এখনকার নাগরিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবস্হা ফিরলেও এগুলির কোনো না কোনো একটিই যেন আমাদের অন্যতম মানুষী পরিচয় হিসেবে আমাদের ব্যক্তিগত আইডেনটিটির সাথে জুড়ে যায়। আধুনিক সমাজের এটাই লক্ষণ। সেই সত্যই প্রতিভাত হয় এ গল্পের শেষে। আত্মকেন্দ্রিকতার এমন পরিচয় আমরা তাঁর অন্যগল্পগ্রন্থের 'ভালো মেয়ে খারাপ মেয়ে' গল্পেও খুঁজে পাই, যেখানে দশ বছরের টুবলু তার বাবার প্রভাবে শৈশব থেকেই স্বার্থপর আর চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। নিউক্লিয়াস পরিবারে বেড়ে ওঠা টুবলু প্রসঙ্গে লেখিকাকে কি আশ্চর্যজনক ভাবেই না বলতে শোনা যায়ঃ "ওইটুকুনি দশ বছরের ছেলে এখন থেকে কী সচেতন নিজেরটা সম্পর্কে! আমার কোনো জিনিস তুমি ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না তো মা!"[১৭] বাবা-মার পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যবহারবোধ থেকেই টুবলুর এই অনুকরণ আর আত্মকেন্দ্রিকতার আচরণ শিক্ষা। লেখিকা বুঝিয়ে দিতে চান শিশুর এ স্বভাবের জন্য আসলে দায়ী আমরা বড়রাই। প্রতিযোগিতামুখী বিপন্ন শৈশবের চিত্র ফুটে ওঠে তাঁর 'রামধনু রং' ও 'কাকতালীয়' গল্পে। 'উনিশ বছর বয়স' গল্পে আছে আর এক জীবন সমস্যা যার নাম 'রাগিং'। এছাড়াও জীবনের বন্দীত্ব ও একঘেঁয়েমি চোখে পড়ে 'শাড়ি, রসমালাই ও বিবাহবার্ষিকী' গল্পে। 'প্রোমোটাররাজ' নামক বাস্তব সমস্যা নিয়ে লেখা তাঁর 'বাড়ী' গল্পটি।

'সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পঃ আমি নারী আমি মহীয়সী' রচনায় জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেনঃ "নারীর নিজস্ব ছন্দ এখানে বাঙ্ময় হয়, গদ্য কাঠামোও ঋজু। নান্দনিকতায় ঋদ্ধ। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পের স্মার্টনেস একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।..... সবার উপরে জীবনকে দেখার এই ডিটেইলিং-এর গুণেই তিনি জিতে যান। কাহিনীর ভাঁজে ভাঁজে শালীমা জরির মতো লীন হয়ে থাকে সুচিত্রার জীবন দর্শন।"[১৮] সুচিত্রা ভট্টাচার্যের আর এক অন্যতম দক্ষতা অপূর্ব ও অনায়াসলব্ধভাবে আধুনিক পরিবর্তনের চিহ্নবাহী মানুষগুলির মনস্তাত্ত্বিক জগতে পৌঁছে যাওয়া। যদিও অভিযোগ করা হয়, কখনও আর্থিক জনপ্রিয়তাকে ধরে রাখতে গিয়ে একটি-দুটি

বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্হার প্রকাশনাতেই আটকে ছিলেন তিনি। আবার সাহিত্যিক জনপ্রিয়তাকে ধরে রাখতে গিয়ে একসময় একটি নির্দিষ্ট ট্র্যাকের বাইরেও আর যেতে চান নি। ফলে জীবন-সম্পর্ক ও উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে একই ভাষা অথবা গণ্ডির বাইরে বের হতে পারেন নি। তবু বলা যায়, সাম্প্রতিক সময়ের মানুষের বিরুদ্ধবাদী প্রবণতা অথবা নেগেটিভ পালসগুলিকে যথাযথভাবে বুঝে নিতে ও বোঝাতে যথেষ্টই সক্ষম ছিলেন গল্পকার সুচিত্রা ভট্টাচার্য। নাগরিক জীবনে মানুষের আত্মিক সম্পর্কের জটিলতা, ভাঙা-গড়া ও সুখ-দুঃখের টানাপোড়েন তাঁর গল্প-উপন্যাসের সহজ প্রাণধর্ম। এই মনোভাবনা থেকেই সৃষ্টির সূত্রপাত তাঁর। সেইসঙ্গে সত্যিকারের সমাজাদর্শের কাছে অবিরাম সৎ ও দায়বদ্ধ থাকার প্রচেষ্টাও তাঁর গল্পকে মর্মস্পর্শী করেছে। তা পাঠকের কাছেও প্রিয় সাহিত্য হয়ে উঠতে পেরেছে। আমাদের সমাজে মেয়েদের অনেক না বলা কথা, প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রাম যা তিলে তিলে জমে ওঠে সমাজের আনাচে-কানাচে—তাকেও বারংবার তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর গল্পে-উপন্যাসে। ‘দহন’-এর ঝিলিক, ‘কাছের মানুষ’-এর তিতির বা ‘নীল ঘূর্ণি’-র দয়িতার মতো নানা বয়সের নারীদের মতো চরিত্র, কখনো বিরুদ্ধ প্রতিবেশে লড়াই করা অথবা অদম্য জেদে লড়তে লড়তেও হেরে যাওয়া যে নারী—তাদের কথাই সতত উঠে এসেছে তাঁর রচনায়। কখনো মিলন, কখনো বিষাদ আবার কখনো ‘ওপেন এন্ডেড’ ভাবনায় গড়া তাঁর গল্প-উপন্যাসের শেষ কথা এর বাস্তবধর্মীতা—যাকে আমরা মন থেকে মেনে নিতে অথবা না মেনে নিতে, যাই করতে পারি না কেন—বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে শেষপর্যন্ত তাকে এক নিদারুণ ও সুকঠোর বাস্তব বলেই স্বীকার করে নিতে হয়।

তথ্যসূত্রঃ

১. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, স্বরচিত গল্পপাঠ (সম্পর্ক), অডিও রেকর্ডিং, The South Asian Literary Recording Project, The Library of Congress Collections, New Delhi, ৬ই অক্টোবর, ২০১০, প্রকাশিত ১৩ই মে, ২০১৫

২. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, ‘এখন হৃদয়’, পৃঃ ২১

৩. তদেব, পৃঃ ১৫

৪. তদেব, পৃঃ ২৫

৫. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, ‘মুহূর্ত’, পৃঃ ৪৯

৬. তদেব, পৃঃ ৪৯

৭. তদেব, পৃঃ ৫৭

৮. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, ‘সহযাত্রী’, পৃঃ ১৭১

৯. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, ‘আয়নার মুখ’, পৃঃ ১২৪

১০. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, ‘নক্ষত্রের মন’, পৃঃ ১৭৬

১১. তদেব, পৃঃ ১৮২

১২. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, ‘খুরশিদ’, পৃঃ ৮৭

১৩. তদেব, পৃঃ ৭৯-৮০

১৪. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, ‘রাঙাকাকা’, পৃঃ ৩৭

১৫. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, ‘রাঙাকাকা’, পৃঃ ৪৩

১৬. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'সুধাকর', পৃঃ ১৪৪

১৭. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'ভালো মেয়ে খারাপ মেয়ে', 'দশটি উপন্যাস', পৃঃ ৫৪১

১৮. 'সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প: আমি নারী আমি মহীয়সী', বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দেব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি; বৈশাখ ও আশ্বিন, ১৪০৬

সহায়ক তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থাবলীঃ

১. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, স্বরচিত গল্পপাঠ (সম্পর্ক), অডিও রেকর্ডিং, The South Asian Literary Recording Project, The Library of Congress Collections, New Delhi, ৬ই অক্টোবর, ২০১০, প্রকাশিত ১৩ই মে, ২০১৫

২. চ্যাটার্জী, সপ্তর্ষি, কাছের মানুষ দূরে গেলেন, মলাট কথা, নিরুক্ত পত্রিকা, ২০১৫

৩. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'ভালো মেয়ে খারাপ মেয়ে', দশটি উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৯

৪. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'শাড়ি, রসমালাই ও বিবাহবার্ষিকী', বৃষ্টি নামার পরে, লালমাটি, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩

৫. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'এখন হৃদয়', সাহিত্যম, সপ্তম প্রকাশ, কলকাতা, এপ্রিল ২০১২

৬. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'বাড়ী', আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১৭ এপ্রিল, ২০০৫

৭. আচার্য, দেবেশ কুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস(১৯৫০-২০০০)', ইউনাইটেড বুক এজেন্সী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১০